স্বামীজী ও রাজা মহারাজ

স্বামী বলভদ্রানন্দ

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধর্মস্থাপনের কাজে অর্জুন এবং ভীম প্রধান মহারথী তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মস্থাপনরূপ মহান জীবনব্রতে সবচেয়ে বড় দুই মহারথী স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সিস্টার নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে 'The Swami Vivekananda and the Order of Ramakrishna' নামক অধ্যায়ে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন, ''... meaningless as would have been the order of Ramakrishna without Vivekananda, even so futile would have been the life and labours of Vivekananda, without, behind him, his brothers of the Order of Ramakrishna." অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ না থাকলে যেমন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অর্থহীন হয়ে যেত তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন, পরিশ্রম ও অবদান ব্যর্থ হয়ে যেত যদি না তাঁর পেছনে যোগ্য আরও পনেরো জন সন্ন্যাসী গুরুভাই থাকতেন। তাঁরা ছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনের মাধ্যমে স্বামীজী তাঁর জীবনব্রত পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিবেদিতা আরও লিখেছেন, "Often it appears to me, in studying all these lives, that there has been with us a soul named Ramakrishna-Vivekananda, and that, in the penumbra of his being, appear many forms"—একটি আত্মা, একটি সত্তাই আমাদের মধ্যে নেমে এসেছিল। তার নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সত্তাটিই আসল; এবং এর উপচ্ছায়ার মধ্যে আমরা অনেককে অর্থাৎ পার্ষদদের দেখছি।

কোনও সন্দেহ নেই স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য স্থান শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা রূপে। 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে রয়েছে যে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই জানতেন না যে তিনি কত বড় ছিলেন—"He was contented to live that great life, and to leave it to others to find the explanation!"—তিনি আপনমনে একটি ভগবৎ-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করে চলে গেলেন আর

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

অন্যদের জন্য রেখে গেলেন সেই জীবনের ভাষ্য রচনার দায়িত্ব। অন্যত্র স্বামীজী বলেছেন, "I read its meaning"—শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনের তাৎপর্য ও অর্থ আমি পাঠ করেছি। বস্তুত এটাই স্বামীজীর ভূমিকা। সেজন্যই ঠাকুর সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে তাঁকে এনেছেন। ঠাকুর স্বামীজীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এই সঙ্ঘ কেমন হবে। তাঁর আদর্শকে স্বামীজী বাস্তবে রূপ দিলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর আদর্শ বেঁচে রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু এই সঙ্ঘের শৈশবেই স্বামীজীর দেহত্যাগ। তিনি থাকাকালীন বেলুড় মঠ সহ বোধহয় মাত্র আটটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। এরপর তাঁর পনেরো জন সন্ন্যাসী গুরুভাই এই সঙ্ঘকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন যা এখন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে চলেছে তার বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে। এই গুরুভাইদের সকলেই মহান, তবুও স্বামীজীর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—যাঁকে আমরা রাজা মহারাজ বা মহারাজ বলি—'শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ' বলে একটি বই সংকলন করেছিলেন। তার ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "The present brochure is from the pen of one who was regarded by the Master as the next to Swami Vivekananda in his capacity for realising spiritual ideas."—এই পুস্তিকাটি এমন একজনের কলম দ্বারা রচিত, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক পরেই স্থান দিয়েছেন। স্বামীজী অবশ্য সবাইকেই বড় দেখতেন, তিনি একবার বলেছিলেন—রাখাল আধ্যাত্মিকতায় আমার চেয়েও বড়। কিন্তু ঠাকুরের কথাটিকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব। ঠাকুর মা স্বামীজী এই দিব্যত্রয়ীর পরেই যিনি আধ্যাত্মিকতায় সর্বোচ্চ তিনি হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রাজা মহারাজ।

স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে চিঠি লেখার সময় সম্বোধন করতেন 'অভিন্নহৃদয়েষু'। অন্য কাউকে তিনি এই সম্বোধন করেননি। উভয়ে উভয়কে চিরকাল অভিন্নহৃদয় বন্ধু হিসেবে বরণ করেছেন। ঠাকুরের কাছে যাওয়ার ছয় বছর আগে থেকেই তাঁরা পরস্পর পরিচিত ছিলেন। অন্য গুরুভাইদের কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরিচয় হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে।

ঠাকুর বলেছিলেন তিনি নরেনকে অখণ্ডের ঘরের সপ্তর্ষির মধ্য থেকে আহ্বান করে এনেছেন। লীলাপ্রসঙ্গ অনুসারে নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত মহাঋষির অন্যতম। কিন্তু শ্রীশ্রীমা পরিষ্কার করে দিয়েছেন : ''(ঠাকুর) নরেনকে বলেছিলেন সপ্ত ঋষির প্রধান।" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে নিজে ডেকে এনেছিলেন, তাই তিনি সর্বদাই জানতেন নরেন্দ্রনাথ কে, কী তাঁর ভূমিকা তাঁর জীবনব্রতে। বস্তুত, নরেনের চেয়েও তিনি বেশি করে জানতেন নরেনের প্রকৃত স্বরূপ ও রামকৃষ্ণলীলায় তাঁর ভাবী ভূমিকাটিকে। যেদিন নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন, সেদিন ঠাকুর বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি জ্যোতির রেখাকে আসতে দেখেছিলেন। হাততালি দিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন—ওই আমার লোক এসে গেছে। তারপর তিনি আঠারো বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, কবে তাঁর সেই লোক, অখণ্ডের ঘরের ঋষি তাঁর কাজে সহায়ক হতে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হবে। তাই স্বামীজীর সঙ্গে যেদিন তাঁর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখা হল সেদিন ঠাকুর বলেছিলেন, ''এতদিন পরে আসতে হয়?" যেন কতদিনের চেনা! তারপর হাতজোড় করে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করলেন : ''জানি প্রভু, তুমি সেই নররূপী নারায়ণ।" আবার নরেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন" —যে-প্রশ্নের উত্তর তখনও পর্যন্ত কেউ দিতে

পারেনি—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তার সরাসরি উত্তর দিলেন : ''দেখেছি বই কী, তোমাকে যেমন দেখছি তার থেকেও বেশি স্পষ্টভাবে দেখেছি; তুমি চাইলে তোমাকেও দেখাতে পারি।'' ঠাকুরের কিছুক্ষণ আগের আচরণ এবং এখনকার উত্তর শুনে নরেন্দ্র বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। নরেন্দ্র বিদায় নেওয়ার আগে তাঁকে ঠাকুর কথা দিতে বাধ্য করলেন যে তিনি আবার শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে আসবেন। ঠাকুর জানতেন, তাঁর মতো নরেন্দ্রও সত্যকে অত্যন্ত মর্যাদা দেন, তাই সত্যরক্ষার জন্য তিনি আসবেনই। বাস্তবিকই, সত্য দিয়ে বাঁধলেন বলেই নরেন্দ্র আবার গিয়েছিলেন, না হলে হয়তো আর কোনওদিন যেতেন না। কারণ ঠাকুরের সম্বন্ধে সেদিন নরেনের মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ইনি মোনোম্যানিয়াক—অর্ধ উন্মাদ।

দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নির্বিকল্প সমাধিতে তুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু দেহধারণের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকাই তাঁর স্বরূপ হলেও সমাধিকে সমাধি বলে চেনার সময় নরেন্দ্রের তখনও হয়নি। ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই মৃত্যু। চেঁচিয়ে উঠলেন : ''ওগো তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাবা আছেন।'' ঠাকুর তাঁর বুকে হাত দিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক করে দিলেন। বললেন, ''তবে থাক, ক্রমে হবে।''

তৃতীয় সাক্ষাতের দিন ঠাকুর মাঝে আর কোনও স্তর রাখলেন না, চট করে তাঁকে নির্বিকল্প সমাধির স্তরে তুলে দিলেন। এটি করলেন অঙ্ক মিলিয়ে নেওয়ার জন্য—যাঁকে তিনি আহ্বান করেছিলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে, সত্যিই কি তিনিই এসেছেন? সমাধিমগ্ন নরেনকে প্রশ্ন করে করে শ্রীরামকৃষ্ণ জেনে নিলেন তিনি কে, কেন এসেছেন, কতদিন থাকবেন ইত্যাদি। ঠাকুর সেদিন জেনেছিলেন নরেন অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, যেদিন নিজের স্বরূপ জানতে পারবেন সেদিনই শরীর ত্যাগ করবেন। ঠিক তা-ই হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই সকালবেলা স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে স্বগতোক্তি করতে শুনেছিলেন : ''যদি আরেকটা বিবেকানন্দ থাকত তাহলে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল''; আর সত্যি সত্যি সেদিনই স্বামীজী শরীর ত্যাগ করেছিলেন। অনুরূপ সতর্কবাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রাজা মহারাজ সম্পর্কেও উচ্চারণ করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর নিজে নির্বাচন করে এনেছিলেন আর রাখালের ব্যাপারে তিনি জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করে মায়ের শরণাগত হয়ে থেকেছিলেন। প্রার্থনা করেছিলেন একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলের জন্য, যে সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, কারণ বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর জিভ যেন জ্বলে যেত। মাকে আরও বলেছিলেন, ছেলেটি যেন হয় 'আমারই মতো'। তারপর রাখাল আসার কিছুদিন আগে জগন্মাতা তাঁর কোলে একটি ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে বলেন—এই তোমার ছেলে! ঠাকুর চমকে ওঠেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর আবার ছেলে? মা হেসে বলেন, এ সাধারণ ছেলে নয়—ত্যাগী মানসপুত্র। ইংরেজি জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'spiritual son'—আধ্যাত্মিক পুত্র। কিন্তু মা কাকে পাঠাচ্ছেন তাঁর মানসপুত্র করে তা তিনি জানতেন না।

নরেন রাখালের থেকে মাত্র ন-দিনের বড়। নরেন্দ্রের সিমলায় জন্ম, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, দুরন্ত, সহজাত নেতৃত্বশক্তি। খেলাধুলা, গল্পবলা, দুষ্টুমি, স্বার্থত্যাগ, সাহসিকতা—সবেতেই তিনি নেতা। পড়াশোনা তাঁর কাছে জলভাত। পরীক্ষাকে গুরুত্ব দেন না কিন্তু অধ্যয়নের বিষয়বস্তু অতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করে নেন এবং গভীরে প্রবেশ করেন। আর রাজা মহারাজের জন্ম বসিরহাট সংলগ্ন শিকড়া

কুলীন গ্রামে হলেও বারো বছর বয়স থেকে তিনি উত্তর কলকাতায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে মাতুলালয়ে থাকতে শুরু করেন, যা কিনা সিমলাপল্লীর কাছে। নরেন ও রাখাল দুজনেরই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। রাখালের পিতা জমিদার আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন হুগলি জেলার আকনার বিখ্যাত জমিদার পরিবারের বংশধর। নরেনের মতো রাখালও ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, দুরন্ত, মেধাবী, সহজাত নেতৃত্বশক্তির অধিকারী; কুস্তিতে ব্যায়ামে ও খেলায় এক নম্বর। দুজনেই অন্তর্মুখ হয়ে যেতে পারতেন যেকোনও সময়। ছোটবেলায় রাখালেরও ধ্যান-ধ্যান খেলা প্রিয় ছিল, যদিও স্বামীজীর মতন ধ্যানের সময় সাপ আসবার মতো চমকপ্রদ ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি। শ্যাম ও শ্যামাবিষয়ক গান শুনতে তিনি ভালবাসতেন। নরেনের মতো সংগীতের রাজা বা শিক্ষিত সংগীতজ্ঞ না হলেও তিনিও গান গাইতে পারতেন এবং গান খুব ভাল বুঝতেন। আজীবন তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব বড় সমঝদার ছিলেন। স্বামী চেতনানন্দের 'প্রাচীন সাধুদের কথা' বইটিতে স্বামী ধীরেশানন্দ এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। রাজা মহারাজ একবার ঢাকায় গিয়েছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-ও তখন ঢাকায়। একদিন বিকেলে ওস্তাদজী ঢাকা আশ্রমে এসে রাজা মহারাজকে সরোদ শোনাচ্ছেন, মহারাজ ধ্যানস্থ হয়ে শুনছেন। কোন রাগটি তিনি বাজাচ্ছিলেন বইয়ে তার কোনও উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রাণ খুলে রাগটি পরিবেশন করার পর ওস্তাদজী মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, ''মহারাজ, এরপর কী বাজবে?'' মহারাজ বললেন, ''বিলাবল বাজান।'' একথা শুনে ওস্তাদজী একেবারে চমৎকৃত। বললেন, ''মহারাজ যে রাগ বাজালাম তারপরে এই পরিবেশে এই সময় বিলাবল রাগ পরিবেশন করতে বলা আপনার মতো সমঝদার লোকের পক্ষেই সম্ভব।'' তিনি মহারাজের পায়ে মাথা রেখে শুধু প্রণামই করলেন না, আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। মহারাজের মতো অলৌকিক সমঝদারের কাছে সংগীত পরিবেশন করতে পেরে স্পষ্টতই তিনি তৃপ্ত ও অভিভূত।

স্বামীজীও সংগীতের সূত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সঙ্গে কখনও মিলিত হয়েছেন। পণ্ডিত রবিশংকরের বইয়ে আছে যে, আলাউদ্দিন গান গেয়েছেন এবং স্বামীজী তাঁর সঙ্গে তবলা বা পাখোয়াজে সঙ্গত করেছেন। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে আমি শুনেছি, ওস্তাদ আলাউদ্দিন তাঁকে বলেছিলেন, ওস্তাদজী ও স্বামীজী উভয়েই উভয়ের কাছে সংগীত পরিবেশন করেছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। সাধারণত দুই সঙ্গীতজ্ঞ ঘরোয়াভাবে মিলিত হলে এমনটাই হয়ে থাকে। আলাউদ্দিন খাঁ লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে স্বামীজীর সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

রাখাল ও নরেনের স্কুল আলাদা কিন্তু কুস্তি লড়তেন একই আখড়ায়, সেখানেই দুজনের আলাপ। এটি ১৮৭৫ সালের কথা। তখন থেকে শুরু করে একেবারে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই পর্যন্ত দুজনে 'অভিন্নহৃদয়' হয়ে থাকবেন। ঠাকুর তখনও তাঁদের জীবনে আসেননি। দুজনে একসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, ব্রাহ্ম বক্তাদের বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনতেন। ১৮৮১ সালের প্রথম দিকে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে নাম লেখালেন। এর অর্থ, লিখিতভাবে ঘোষণা করা যে আমি সাকার মানি না, ইত্যাদি। কিন্তু পরে যখন তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন তখন ঠাকুর বললেন, রাখালের সাকারের ঘর আর নরেন্দ্রের নিরাকারের ঘর। তাই ঠাকুরের কাছে যাওয়ার পর রাখালের কোনও অসুবিধা হয়নি মা কালীকে ও রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করতে। কিন্তু স্বামীজীর অসুবিধা হয়েছিল। তাই প্রথম প্রথম তিনি রাখালকে নিষেধ করতেন প্রতিমা প্রণাম করতে, ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করতেন একইসঙ্গে সাকার উপাসনা ও

সর্বভূতে ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু ক্রমশ নরেন রাখাল উভয়েই ঠাকুরের মতো সাকার, নিরাকার, সর্বভূতে এক ব্রহ্ম—এসবই মেনেছেন।

নরেন রাখাল উভয়েই ছোটবেলা থেকেই ধর্মপরায়ণ হলেও যৌবনের উন্মেষে তাঁদের সেই ধর্মভাব আরও প্রবল হয়ে উঠল। ফলে রাজা মহারাজের মন পড়াশোনার দিক থেকে উঠে গেল। স্বামীজী কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন। কোনওদিন তিনি পড়াশোনাকে অবহেলা করেননি। রাজা মহারাজের বাবা, এক্ষেত্রে সংসারী লোকেরা সাধারণত যা করেন তাই করলেন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহ হল কোন্নগরের মনোমোহন মিত্রের একাদশ বর্ষীয়া বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে। রাখালের বয়স তখন আঠারো। কিন্তু সংসারে বাঁধার জন্য বাবা বিবাহ দিলেও এর মাধ্যমেই তিনি গিয়ে পৌঁছলেন তাঁর জীবনদেবতার কাছে। মনোমোহন ও তাঁর মা দুজনেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। ১৮৮১ সালের জুন-জুলাই মাসে রাখালের বিবাহ হয়; তার কিছুদিন পরই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে নতুন জামাইকে দেখানোর জন্য কোন্নগর থেকে নৌকো করে রওনা হলেন। তখনও তাঁরা এসে পৌঁছননি, সেইসময় ঠাকুরের এক অদ্ভুত দর্শন হল। গঙ্গা যেন যমুনা হয়ে গেছে আর সেখানে এক প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এক সখা হাত ধরাধরি করে নৃত্য করছেন। অদ্ভুত শোভা! একটু পরেই মনোমোহন রাখালকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, ঠাকুর দেখেই বুঝলেন একেই তো মা একটু আগে দেখালেন! নাম জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তর এল 'রাখাল'। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, বললেন, ''সেই নাম!'' সেই ব্রজলীলার অনুষঙ্গ জড়ানো নাম! এরপর থেকে রাখাল ঠাকুরের কাছে আসতে শুরু করলেন।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আসেন ১৮৮১-র ডিসেম্বরে অর্থাৎ রাখাল ঠাকুরের আসার পাঁচ-ছয় মাস পরে। উভয়কেই ঠাকুর তাঁদের সহজাত সংসারবৈরাগ্যের জন্য কাল্পনিক হোমাপাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে-পাখি কখনও মাটি স্পর্শ করে না। উভয়েই অলৌকিকভাবে মহান। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায়, তাঁর ধর্মস্থাপন ব্রতে এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁরা দুজনেই অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও তাঁদের দুজনের ভূমিকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের দৈবী সম্পর্কের প্রকৃতিতেও। নরেন সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন, ''নরেনকে আমি আত্মার স্বরূপ মনে করি।'' আর রাজা মহারাজ সম্বন্ধে বলছেন, ''আমার মতো।'' ঠাকুরের কথা অনুযায়ী স্বামীজী ঠাকুরেরই আর একটি রূপ। তাঁরা দুজন অভিন্ন। দুজনে বসে আছেন পাশাপাশি, দুজনের হাঁটুটা প্রায় ঠেকে গেছে। ঠাকুর পরপর নিজের আর নরেনের হাঁটু স্পর্শ করে বলছেন, ''দেখছি এটাও আমি ওটাও আমি; যেন জলের মধ্যে একটা লাঠি ফেলে দুটো ভাগ করেছে।'' ঠাকুর একদিন স্বামীজীকে নিজের হুঁকো থেকে তামাক খেতে বলছেন। স্বামীজী আপত্তি করে বলছেন, ''আমি আপনার হুঁকোতে মুখ লাগালে তো আপনার হুঁকো উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে!'' ঠাকুর তাতে বলছেন, ''তোর তো ভারি ভেদবুদ্ধি! তুই আর আমি কি আলাদা?'' নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুর আরও অনেক প্রশস্তিসূচক কথা বলেছেন—নরেন সহস্রদল পদ্ম, মাছের মধ্যে রাঙাচক্ষু রুই ইত্যাদি। কেউ নরেনের প্রশংসা করলে বলতেন যে, ইনি ভাল লোক, কারণ ইনি নরেনের সুখ্যাতি করেছেন। আবার সচেতনও ছিলেন নরেনের প্রতি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে। একদিন বলছেন, ''নরেন বেশি আসে না, সে ভালই। সে এলে আমি বিহ্বল হই।'' সত্যিই বিহ্বল হয়ে পড়তেন। যেমন দেবদেবীর নাম শোনা মাত্র তিনি অনেক সময় ভাবাবিষ্ট হতেন, তেমনি দূর থেকে নরেন আসছে দেখলে তিনি অনেক সময় ''ওই ন'' বলে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন।

বাবুরাম মহারাজ যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করেন সেদিন তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল নরেনের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত ভালবাসার প্রকাশ সারারাত ধরে লক্ষ করার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রামদয়ালবাবু বলে এক ভক্ত। তাঁরা শুয়েছিলেন ঠাকুরের ঘরের বাইরের বারান্দায়। সেদিন ঠাকুর সারারাত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একটু পরপর বাইরে এসে রামদয়ালবাবুকে ঘুম থেকে তুলে বলছিলেন, ''ওগো তুমি একটু নরেনকে খবর দিও তো! সে যেন একবার আসে। কেন সে আসে না? আমার বুকের ভেতর গামছা নিংড়ানোর মত যন্ত্রণা হচ্ছে তাকে না দেখে, অথচ সে একটুও বোঝে না!'' সারারাত ওই ভাব। বাবুরাম মহারাজ অবাক হয়ে ভাবছেন, একটা মানুষ আর একটা মানুষকে এত ভালও বাসতে পারে? আর সেই মানুষটাই বা কেমন নিষ্ঠুর যে এর এরকম ভালবাসাটা বুঝতে পারে না? তারপর আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর খুশিতে উদ্বেল কারণ সেদিন নরেন এসেছে!

নরেনকে আত্মার স্বরূপ বলে মনে করতেন বলেই ঠাকুর শুধু স্বামীজীকে ভালই বাসতেন না, সমীহ করতেন, মর্যাদা দিতেন। স্বামী সারদানন্দজী, লীলাপ্রসঙ্গে উভয়ের সম্পর্কের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, আমরা ধর্মজগতে দেখি শিষ্য গুরুকে সম্মান করে, মর্যাদা দেয়। কিন্তু গুরু যে শিষ্যকে সম্মান করে ও বিশেষ মর্যাদা দেয় তা আমরা ঠাকুর আর স্বামীজীর সম্পর্কের মধ্যে দেখেছি। এর কারণ, ঠাকুর সবসময় স্বামীজীর স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

রাজা মহারাজ সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন তিনি তাঁর মতো। স্বামীজী আপাতদৃষ্টিতে আর একটি ব্যক্তিত্ব, কিন্তু আসলে শ্রীরামকৃষ্ণই। আর রাজা মহারাজ আর একটি ব্যক্তিত্ব, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরূপ। রাজা মহারাজ সম্বন্ধেও ঠাকুর অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন। বলেছেন, রাখালের বালকভাব, ওর দোষ দেখতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বের হয়। মজার ব্যাপার হল, স্বামীজী রাজা মহারাজের থেকে মাত্র ন-দিনের বড়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করেন না যে নরেনের গলা টিপলে দুধ বের হয়। আমরাও ঠাকুরের 'খাপখোলা তরোয়াল' নরেন সম্বন্ধে এই কথাটা ভাবতে পারি না। কিন্তু ঠাকুরের কথা তো ভুল হতে পারে না! রাজা মহারাজের বালকস্বভাব তাঁর আজীবন ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের বেশ কিছু পরে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে বাবুরাম মহারাজ একবার মন্তব্য করেছিলেন, ''আমরা সবাই এই পাঁচ বছর বয়সী বালগোপালের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আছি।'' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেছেন, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে বালকভাব আর রাজবুদ্ধি একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় কারণ দুটি পরস্পরবিরোধী। রাজার মাঝে বালকভাব আবার পরক্ষণেই সেই বালকের মধ্যে রাজার ভাব যদি হয়, সেই রাজা বা বালককে কোনও লোক মানতে পারে কি? কিন্তু রাজা মহারাজের ক্ষেত্রে তাঁর বালকভাব ও রাজার ভাব দুটোই মনে হত স্বাভাবিক। কারণ এই দুটি ভাবের সঙ্গে, বস্তুত তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই, সবসময়ের জন্য অনুস্যূত ছিল তাঁর ব্রহ্মভাব। তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একটি কবিতায় যথার্থই লিখেছেন, ''বাহিরে বালকহাস ভেতরে ব্রহ্মবিকাশ।'' ভেতরের ব্রহ্মভাবের জন্যই বালকভাব আর রাজার ভাব দুই-ই তাঁর ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হত। এজন্যই সুদীর্ঘ বাইশ বছরকাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নেতৃত্ব দিয়ে একে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

আমরা দেখেছি, রাজা মহারাজ আসার আগে মায়ের কাছে ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন, ''এমন একটা শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে দাও যে হবে আমার মতো।'' একথার অর্থ কী? ত্যাগ-বৈরাগ্য-পবিত্রতা-

ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসিসুলভ আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে ঠাকুরের প্রতিটি সন্ন্যাসী সন্তানই তো ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো। তাহলে কোন বিশেষ দিকে সব পার্ষদদের মধ্যে—এমনকী স্বামীজীকেও বাদ দিয়ে—একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের মতো? তিনি 'ঠাকুরের মতো' ভেতরের ঈশ্বরময় ব্যক্তিত্বটির বাহ্যিক প্রকাশ-লক্ষণে। ঠাকুর যেমন রঙ্গরস করতেন আবার মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হতেন, সাধারণ কথা বলতে বলতে সামান্য উদ্দীপনেই ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, রাজা মহারাজও ছিলেন তাই। তাঁর বালকভাবও যেন ঠাকুরেরই উত্তরাধিকার, কারণ ঠাকুরের মধ্যেও অদ্ভুত বালকভাব ছিল। কথামৃতে আছে, ঠাকুরের কাছে একটি চ্যাঙারিতে তাঁর প্রিয় জিলিপি রাখা আছে। এমন সময় ঘরে ভক্তদের সঙ্গে একটি ছোট বালক ঢুকেছে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঙারিটি কাপড়ের আড়ালে লুকোচ্ছেন, পাছে বাচ্চাটি নিয়ে নেয়! স্বামী তপানন্দ বর্ণনা করেছেন, ''শ্রীশ্রীমহারাজ যখন মঠে আসতেন তখন মনে হত আমরা যেন কৈলাস বা বৈকুণ্ঠে আছি। মঠে আনন্দের মেলা, চাঁদের হাট বসে যেত। কত কথা, কত ধ্যান-ধারণা-সমাধির মধ্যে দিয়ে দিনরাত কেটে যেত। এই বাচ্চাদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছেন আবার পরমুহূর্তে এত গম্ভীর হয়ে যেতেন যে বাবুরাম মহারাজের মতো মানুষও কথা বলা তো দূর, উঁকি মারতেও সাহস পেতেন না। এই হয়তো খুঁটিনাটি বিষয় খোঁজ নিচ্ছেন আবার তক্ষুনি শরীর সম্বন্ধেও হুঁশই নেই।'' এগুলিই ঠাকুরের মতো লক্ষণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ঠাকুরও মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন যে, তখন তাঁর কাছে যেতে কেউ সাহস পেত না। আর কোনও পার্ষদ বাহ্যলক্ষণে এতটা 'ঠাকুরের মতো' ছিলেন না। মঠ-মিশনের সাধুপরম্পরাক্রমে শোনা যায়, শেষকালে মহারাজের চেহারাটাও ঠাকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেখে ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদেরও মনে হত, যেন ঠিক ঠাকুরই।

স্বামীজী ও রাজা মহারাজের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও ভালবাসা ছিল দেখার মতো। স্বামীজী বলতেন, ''রাখাল আমাদের মঠের শোভা।'' ''রাখালের আধ্যাত্মিকতা আঁকড়ে পাওয়া যায় না।'' এক পাশ্চাত্য ভদ্রলোক স্বামীজীর কাছে এসেছেন কিছু আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে। স্বামীজী তাঁকে বললেন, "There is a dynamo working and we are all under him." এই বলে তাঁকে রাজা মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দেহত্যাগের পাঁচ মাস আগে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে তাঁর কাজের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ নিতে বলেন। একটি চিঠি লিখে তাঁকে জানান, ''তোমার যদি আমার কাছ থেকে কোনও উপদেশের দরকার হয় বা কাউকে দিয়ে তোমার কোনও কাজের প্রয়োজন থাকে তবে ব্রহ্মানন্দই হচ্ছে একমাত্র লোক যার নাম আমি সুপারিশ করব—আর কেউ নয়, আর কেউ নয়। এ-ব্যাপারে আমার বিবেক পরিষ্কার।'' ইংরেজিতে লেখা পত্রটির তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২। স্বামীজী বলতেন, ''যদি সবাই আমাকে কখনও ছেড়েও যায়, রাখাল আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে।''

তাঁরা উভয়ে উভয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য জয় করে কলকাতায় এসেছেন, সবাই বলছে 'বিবেকানন্দের জয়'। কিন্তু বিবেকানন্দ জানেন, এ-জয় শ্রীরামকৃষ্ণের! তাঁর অন্তর প্রণতি নিবেদন করতে চাইছে শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাই যেই রাজা মহারাজকে প্রথম দেখলেন, বয়সে নিজে বড় হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—গুরুর পুত্র গুরুরই সমান। অর্থাৎ তোমাকে প্রণাম করে আমি প্রণাম করলাম আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেই। রাজা মহারাজও অনুভব করছেন,

বিবেকানন্দের এই কীর্তি আসলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কীর্তি। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকে প্রতি-প্রণাম করে বললেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিতা'—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতারই সমান। তোমাকে প্রণাম করে আমিও আমার পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম করলাম।

একদিন দুপুরে স্বামীজী গা-হাত-পায়ে ব্যথা অনুভব করছেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ডাকলেন তাঁকে ম্যাসাজ করে দেওয়ার জন্য। শরচ্চন্দ্র চেষ্টা করলেন সাধ্যমতো। কিন্তু স্বামীজী তাঁর পালোয়ানী শরীরে আরাম অনুভব করলেন না, বললেন মহারাজকে ডেকে দিতে। মহারাজ তখন দুপুরের প্রসাদের পরে একটু বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। স্বামীজী ডাকছেন শুনেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন এবং ধুতিটা মালকোঁচা মেরে প্রায় দুঘণ্টা ধরে স্বামীজীর গা টিপে দিলেন, নিজে গলদ্‌ঘর্ম হয়েও। এবার স্বামীজীর আরাম হল। রাজাকে তিনি চলে যেতে বললেন কিন্তু শরচ্চন্দ্রের মনে ভীষণ খটকা। তিনি মহারাজকে গিয়ে বললেন, ''আপনি ঠাকুরের মানসপুত্র, মঠের প্রেসিডেন্ট—স্বামীজী আপনাকে দিয়ে পা পর্যন্ত টেপালেন?'' শোনা মাত্র মহারাজ জিভ কেটে বললেন, ''কি বলছিস তুই? সাক্ষাৎ শিব!''

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সভ্যরা কীভাবে চলবে তার জন্য স্বামীজী একটি খসড়া আচরণবিধি (code of conduct) তৈরি করেন এবং সেটি আলোচনার জন্য ঠাকুরের শিষ্যদের নিয়ে বলরাম মন্দিরে একটি সভা ডাকেন। স্বামীজী কাগজটি সবাইকে পড়তে দিলেন। প্রত্যেকে মনোযোগ সহকারে পড়লেন, মন্তব্য করলেন, কেউ কেউ কিছু পরিবর্তনও সুপারিশ করলেন—কিন্তু সবাই সেটি অনুমোদন করলেন। শুধু রাজা মহারাজ কিছু বললেন না। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ''কি হল রাজা? তুমি কিছু বলছ না যে? তোমার কি এটা পছন্দ হচ্ছে না?'' মহারাজ বললেন, ''না নরেন, এত নিয়মকানুন আমার পছন্দ হচ্ছে না।'' স্বামীজী আর একটিও কথা না বলে কাগজটি ছিঁড়ে ফেললেন।

এরপরে স্বামীজী আলমবাজার মঠে চব্বিশটি এবং পরে মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে, তখন একশো ষোলোটি নিয়ম সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন। আলমবাজার মঠে শুদ্ধানন্দজী ও পরবর্তী একশো ষোলোটি নিয়ম মহাপুরুষজী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এগুলি রামকৃষ্ণ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা বেদের মতো মেনে চলেন। এই নিয়মগুলিতে স্বামীজী যেমন রামকৃষ্ণ মঠের আদর্শ, অনুরূপ আদর্শে স্ত্রীমঠ স্থাপনের আবশ্যকতা, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের সঙ্গে সনাতন শাস্ত্রের সম্পর্ক এবং সাধু-ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনবিধি নির্দেশ করে গেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন যে এই সঙ্ঘের আদর্শ গোটা মানবজাতির জীবনচর্যায় এক আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক রূপান্তর আনবে।

একদিন বেলুড় মঠে রাজা মহারাজের ঘরে স্বামীজী-প্রণীত এই নিয়মগুলি পড়া হচ্ছে আর মহারাজ ধ্যানস্থ হয়ে শুনছেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ বললেন, ''এসব কথা স্বামীজী এ দেহে থেকে বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর বলেছেন এবং তারকদা (মহাপুরুষ মহারাজ) লিখেছেন। এসব কথা কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ করে স্বামীজী বলেননি। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, তাঁর ভাব প্রচারের জন্য বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় সকলের সমান অধিকার—তা সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ বা নীচ বংশের হোক।... তোমরা জীবনে এইসব সরল বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করো, আচরণ করো আর একধার থেকে ছড়াতে থাকো। দেখবে কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্যযুগের আবির্ভাব হবে।''

ঠাকুরের যে-ভাবটিকে রূপ দিয়ে স্বামীজী এই সঙ্ঘকে গড়ে দিয়ে গেছেন, সেই ভাবটি যাতে পরবর্তী প্রজন্মের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনে প্রতিফলিত হয়, সেজন্য রাজা মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনধারাটিকে একটি স্পষ্ট রূপ দিয়ে গেলেন। তিনি বলতেন, ''আমরা ছাঁচ গড়ে গেলাম, তোরা দাগা বুলিয়ে যা।'' স্বামীজী মঠ-মিশনের সাধুদের motto হিসেবে উচ্চারণ করে গেছেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বাক্যটি। প্রতিটি সাধুর জীবনব্রত হবে নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণসাধন। এটিকে জীবনে রূপায়িত করার জন্য তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের বলতেন, ''Meditate, meditate, meditate and serve his creatures.''—ধ্যান করো আর সেবা করো। স্বামীজী বলেছেন, work is worship. তিনিও বলতেন, ''কর্মই উপাসনা, কর্মই উপাসনা।'' আর কাজকে যাতে সত্যিই উপাসনায় পরিণত করতে হয়, তার উপায় হিসেবে তিনি বলতেন, ''স্বামীজী বলেছেন, work is worship. আমি কিন্তু আর একটু অন্যরকম করে বলি, work and worship. কাজের সঙ্গে বিচার ও ধ্যানভজন না থাকলে ঠিক ঠিক work is worship হয় না।'' এইভাবেই রাজা মহারাজ সঙ্ঘের উচ্চ আদর্শকে, তার উচ্চতা ও গভীরতাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে, সরল সুস্পষ্টরূপে সাধু-ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনে নামিয়ে এনেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের সাধুরা রাজা মহারাজ কৃত সেই ছাঁচই অনুসরণ করে চলেছেন এবং চলবেনও সর্বদা, কারণ এই ছাঁচই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের ছাঁচ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তথা রামকৃষ্ণ-লীলায় এইটিই রাজা মহারাজের প্রধান অবদান। স্বামী অশোকানন্দ লিখেছেন, ''এই সঙ্ঘ স্বামীজী যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সঙ্ঘ যেন ঠিক সেইভাবেই গড়ে ওঠে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই দায়িত্বভার নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। তাই স্বামীজীর ভাবের অতিরিক্ত একটি ভাবও তিনি এই সঙ্ঘের ভাবাদর্শের মধ্যে যোগ করেননি।''

নিবন্ধ শেষ করব উভয়ের জীবনের দুটি ঘটনাকে উল্লেখ করে।

স্বামীজী নিউইয়র্কের একটি বাড়িতে গেছেন, সঙ্গে মিস এলেন ওয়াল্ডো। স্বামীজীর ঘরে একটি দেওয়ালে মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা একটা আয়না লাগানো আছে। ওয়াল্ডো দেখছেন, স্বামীজী বারবার আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নিজেকে ভালভাবে দেখছেন, তারপর চিন্তিতভাবে পায়চারি করছেন। ওয়াল্ডোর বুক কেঁপে উঠল : তাহলে কি এই নিখাদ মানুষটিরও একটি ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ল? স্বামীজী সুদর্শন সবাই জানে, তবে কি তিনি নিজের সুন্দর চেহারাটিই আয়নায় বারবার দেখছেন? তিনিও কি সাধারণ মানুষের মতো রূপসচেতন? এমন সময় মিস ওয়াল্ডোর দিকে স্বামীজীর চোখ পড়ল। খুব বিপন্নর মতন তিনি বললেন, ''এলেন, এ যে দেখছি সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমি আমার নিজের চেহারা মনে করে রাখতে পারি না। আমি আয়নায় এত করে নিজেকে দেখে নিচ্ছি, কিন্তু যে-মুহূর্তে মুখ ফেরাই, অমনি ভুলে যাই যে আমাকে কেমন দেখায়।''

রাজা মহারাজের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রায়ই ঘটত অনুরূপ ঘটনা। জরুরি কিছু কাগজপত্র তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছে সই করার জন্য। কয়েকদিন হয়ে গেছে কিন্তু তিনি সই করতে পারছেন না। কারণ নিজের নামটাই মনে করতে পারছেন না।

নামরূপাত্মক এই জগৎ। এর পরপারে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মভূমি। দুই মহারথীর একজন রূপ ভুলে যাচ্ছেন, আর একজন নাম। এ-থেকেই আমরা বুঝতে পারি, কোন্ উচ্চভূমিতে অবস্থান করে এঁরা দুজন শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় তাঁদের নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাই তাঁদের কাজ এত অমোঘ এবং নির্দেশাবলি এত অভ্রান্ত।